বাংলাদেশে নারীর অগ্রযাত্রা এক শতকের অর্জন

চিররঞ্জন সরকার

একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের নারীরা চার দেয়ালের মধ্যে অনেকটাই অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতেন। এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে হলেও পর্দা ব্যবহার করতে হতো। তাদের না-ছিল চলার স্বাধীনতা, না-ছিল বলার স্বাধীনতা। তাদের জীবনে আরাম-আয়েশ বলে কিছু ছিল না। ছিল না কোনো সাধ-আহ্লাদ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য। পরিবারের পুরুষ সদস্য কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠদের ইচ্ছায় অধিকার-মর্যাদা-সম্মান ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত নারীরা ভৃত্য বা শ্রমদানকারী পশুর মতো কেবল ক্রমাগত সেবা দিয়ে শ্রম দিয়ে কোনোরকমে জীবন কাটাত। সেই অন্ধকারপর্ব থেকে ধারাবাহিকভাবে একটু একটু করে নারীরা আলোর পথে এগিয়েছে। শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা আর নারী অন্দোলনের প্রগতিমুখী অভিযাত্রা নারীকে অগ্রগতির পথে নিয়ে এসেছে। এখন অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা ভালো-মন্দ বিবেচনা করে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। চার দেয়ালের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবনযাপনের গ্লানিকে পেছনে ফেলে নারীরা আজ বাইরের দুনিয়ায় জীবনযুদ্ধের লড়াকু সৈনিক হিসেবে অবির্ভূত হয়েছে। গত একশ বছরে নারীর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড়ো অর্জন।

বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের ঐতিহ্য

সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দালনের পথ ধরেই বাংলাদেশের নারী প্রগতির পথে এগিয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে আমাদের দেশে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। একদিকে শিক্ষার প্রসার, অন্যদিকে ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতির বিকাশ এ অঞ্চলের নারীর অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেইদিক থেকে ১৮৫৭ সাল ছিল এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাকাল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নারী প্রগতির নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয় নি বটে, তবে স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কাজ ততদিনে শুরু হয়ে গেছে। সিপাহী বিদ্রোহেও নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ঝাঁসির রানি, তার সহচরী মোতিবাই, রানি লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। আরো অনেক নারী ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯১০ সালে প্রথম নারীবাদীরূপে খ্যাত সরলা দেবী চৌধুরাণী ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল নামে সর্বভারতীয় নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এলাহাবাদে। বাংলার মেয়ে হলেও বিবাহসূত্রে তাঁকে উত্তর ভারতে চলে যেতে হয়েছিল। এরপর থেকেই বিদূষী নারীদের নেতৃত্বে একাধিক নারী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। এসব সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের ব্রিটিশবিরোধী চেতনায় অনুপ্রাণিত করা, নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো ও তাদের উপার্জনশীল কাজে যুক্ত করা।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) মুসলিম নারী জাগরণের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। অবরোধপ্রথার কারণে বেগম রোকেয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বলতে গেলে বঞ্চিতই হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত এবং তাঁর ক্ষুরধার লেখনী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে। নারী স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর যুক্তিতর্ক অসাধারণ। বর্তমান একুশ শতকেও তাঁর রচনা ও বক্তব্য আমাদের পথ-নির্দেশনা দেয়। ১৯১৬ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম। একই সময় প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় মহিলা সমাজ। অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স বা নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সালে।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের ৬০ লাখ নারীর ভোটাধিকারের আইন পাস করেন এবং সেবারই প্রথম রাজ্য পরিষদের ১৫০ আসনে ৬ জন ও কেন্দ্রীয় সংসদে ২৫০ আসনে ৯ জন নারীর প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত হয়। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে ধনী, শিক্ষিত, মহারানি, বেগমদের পাশাপাশি কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, হংস মেহেতা, রামেশ্বরী নেহরু, মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি প্রমুখ কংগ্রেস নেত্রী যুক্ত ছিলেন। জেলমুক্ত কংগ্রেসী নারীরা ছাড়াও অনুশীলন দল, শ্রী সংঘ প্রভৃতি দলের নারীরা কংগ্রেস মহিলা সংঘে কাজ করতেন।

১৯৫০ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষিত হলে দেখা যায়, তাতে মেয়েদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে নারীরা আন্দোলন গড়ে তোলেন। মূলনীতিতে নারীদের ঘরের বাইরে কাজের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ছিল। ওলেমা বোর্ড নারীদের অধিকার বিষয়ে বিরূপ বক্তব্য রাখায় নারীরা প্রতিবাদ জানান। গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, পাক কৃষ্টি সংসদ ও পুরানা পল্টন মহিলা সমিতি এক যুক্ত বিবৃতিতে বলে, 'গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়েছে। এর ফলে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নীতি উপেক্ষিত হবে।' গ্রামবাংলায় মেয়েদের প্রতি সমাজের মনোভাব ছিল আরো কঠোর। অবরোধ সেখানে কড়াকড়িভাবে আরোপিত ছিল। তখন আনন্দ-অনুষ্ঠান, গান, অভিনয় সব একে একে বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মপ্রাণ নারীরা ঈদের জামাতে নামাজ পড়তে চেয়েও বাধা পান। এ ধরনের মানসিকতা ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই নারীসমাজ প্রতিবাদ জানাতে থাকে।

মেডিকেল কলেজের নার্সদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকলে নারীসমাজ তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। মিটফোর্ড হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ওয়ার্ডকে ডাক্তারদের বাসস্থান করা হলে ১৯৫১ সালে নারীসমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। আন্দোলনের ফলে এই ওয়ার্ড পুনরায় চালু করা হয়। নার্সদের রাতের ডিউটি একমাসের বদলে ১৫ দিন, অসুস্থ নার্সদের হাসপাতাল থেকে ওষুধ সরবরাহ, আলাদা ভিজিটিং রুমের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি মেনে নেওয়া হয়। নারীনেত্রীরা চা বাগানের নারীশ্রমিকদের ওপর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেন। রাজধানীতে মেয়েদের স্কুলের গাড়ির ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা আন্দোলন করেন। বঙ্গীয় মুসলিম বিবাহ আইন ও তালাক রেজিস্ট্রেশন বিলের সংশোধনী নিয়ে সে সময় প্রাদেশিক পরিষদে আলোচনা চলার সময় নারীরা সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ জানালে বিলটি স্থগিত হয়ে যায়। ওই বিলের মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে এবং পুরুষের পক্ষে সুবিধা বাড়ানোর চেষ্টা চলে।

মুক্তিযুদ্ধের আগে '৪৭ থেকে '৭০ পর্যন্ত বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলনকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়ে সরকারিভাবে দমন করা হতো। স্বামী, বাবা বা অভিভাবকদের চাকুরির ওপর চাপ সৃষ্টি করে নারীনেত্রী ও কর্মীদের আন্দোলন থেকে বিরত রাখার দমননীতি চালু ছিল। সমাজকল্যাণমূলক কাজই নারী সংগঠনের আন্দোলনের মূল কাজ ছিল। তখনো আমাদের দেশে এনজিও কার্যক্রম শুরু হয় নি। গৃহবধূ ও সমাজকর্মী নারীরা ঘর সংসারের কাজের পাশাপাশি বেগম ক্লাবে সমবেত হতেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখনীর উসকানির পাশাপাশি সওগাত সম্পাদক প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন 'বেগম' পত্রিকার মাধ্যমে ও ক্লাবের আলোচনায় হাজার হাজার অধিকারসচেতন নারীকে আন্দোলন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই নেত্রীরাই বহুবিবাহের বিরুদ্ধে, যৌতুক ও সম্পত্তিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন করেছেন, '৫০-এর দশকে ভাষা আন্দোলনে শরিক হয়েছেন, '৬০-এর দশকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনে যুক্ত থেকে নতুন মাত্রার নারী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়াও ব্রিটিশ শাসনমুক্ত পাকিস্তানের এই ভূখণ্ডে নারীর অধিকার নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করেছেন এই সচেতন নারীরা।

মূলত ১৮৫৭ থেকে ১৯৭১, বাঙালি জাতির সংগ্রাম অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবেই বিস্তার লাভ করেছে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলিম নারীরাও প্রাগ্রসর ভূমিকা রাখেন। যদিও দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করে এবং ভারতবাসী খণ্ডিত স্বাধীনতা অর্জন করে। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ স্বাধীন হয়। তারপরও রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন নারী সংগঠন গড়ে ওঠে, যেসব সংগঠন সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়। এর সঙ্গে নিপীড়িত-শোষিত সাঁওতাল, ভূমিদাস, কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনও যুক্ত হয়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে উপমহাদেশে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আন্দোলনে নারীরা অনবদ্য ভূমিকা পালনের পাশাপাশি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক আন্দোলনেও সক্রিয় থাকেন। এভাবেই তারা একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণ-পীড়ন বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুক্তির পথ খুঁজেন, অপরদিকে পাশ্চাত্য নবজাগরণের দৃষ্টান্ত ও প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে সমাজ সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলে।

১৯৬৯-এ সর্বস্তরের নারীর অংশগ্রহণে গড়ে ওঠে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ। গণঅভ্যুত্থানে নারীরা ব্যাপকভাবে অংশ নিতে শুরু করেন। ১৯৭০-১৯৭১ সমগ্র জাতির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সময়। এ সময় নারী আন্দোলনের নেত্রী সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী করে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা পরিষদ। নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বেগম সুফিয়া কামাল ও মহিলা পরিষদের ভূমিকা অপরিমেয়।

দীর্ঘদিনের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সময়ের গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনের ধারায় ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ হয়। মুক্তিযুদ্ধে নারীরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারামন বিবি, কাঁকন বিবি, জিন্নাত আরা, সেতারা বেগম, শিরিন বানু মিতিলসহ অনেকে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজিত হলে এ দেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে পরিণত হয়। বহির্বিশ্বের বন্ধ জানালাগুলো স্বাধীনতার পর খুলে যায়। চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে Women's International Democratic Federation (WDIF) বা আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশন-এর পক্ষ থেকে একটি নারী প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই দিল্লি সফরে আসেন। সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নারীসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে মতিয়া চৌধুরী ও মালেকা বেগম যোগদান করেন। সেই সভাতেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে ডব্লিউডিআইএফের অন্তর্বর্তীকালীন সদস্যপদ দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালে খ্যাতনামা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী প্রয়াত জাহেদুর রহিমের সেগুনবাগিচার ছোট্ট বাড়িটি ভাড়া নিয়ে মহিলা পরিষদের কার্যক্রম চলতে থাকে। ওই বছরই (১৯৭২) বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে অনুষ্ঠিত WDIF-এর কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা যথাক্রমে কবি সুফিয়া কামাল ও মালেকা বেগম সেখানে যোগ দেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মহিলা পরিষদ সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে প্রথম বাংলাদেশের মাটিতে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্পর্কে প্রবন্ধ ছাপা হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোও এ দিবস পালনে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ অন্যান্য নারী সংগঠন এই দিবস পালন করতে শুরু করে।

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো দেশ স্বাধীন হবার পর বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সংকট এবং এনজিওদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করবার আগ্রহের ফলে গ্রাম ও শহরের ব্যাপকসংখ্যক নারী বৃহত্তর সামাজিক জীবনে প্রবেশ করে। রাজনৈতিক সংগ্রামেও নারীরা যুক্ত হন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বর্ধিত হারে নারীদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এভাবেই পথে বেরিয়ে পড়া নারীরা ক্রমশ তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হতে থাকেন।

নারীর অর্জন : রাজনীতি, সংসদ ও স্থানীয় সরকারে অভাবনীয় সাফল্য

দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তথা সংসদ, রাজনৈতিক দল ও সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অন্য যেকোনো খাতের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষস্থানে টানা ১৯ বছর ধরে নারীর অবস্থান পুরো দক্ষিণ এশিয়ায়, এমনকি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার অভাবনীয় নজির সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে গত ১৫ বছরে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা ও সামাজিক সংগঠনেও নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ব্যাপক হারে। যদিও প্রশাসন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্যসহ বাকি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছেন। তারপরও স্থানীয় সরকার, সংসদ ও রাজনৈতিক দলে সংখ্যার দিক থেকে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতায় নারীর অধিষ্ঠিত হওয়া ছাড়াও সংসদের বাইরে বিভিন্ন সরকারবিরোধী আন্দোলনে নারীর রাজনৈতিক ভূমিকা নারীর সার্বিক অগ্রগতির পথকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে, নবম জাতীয় সংসদকে নারীর ক্ষমতায়নের মাইলফলক হিসেবে

উল্লেখ করা যায়। সরাসরি নির্বাচনে বাংলাদেশে সেবারই প্রথম নারীর সংসদে অবস্থান শতকরা ১৮ দশমিক ৬ ভাগে উন্নীত হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এ সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ৯ দশমিক ১ ভাগ।

বর্তমানে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় নারীর অবস্থান ৮ দশমিক ৩ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রিত্বসহ স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে নারীরা পূর্ণমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন নারী প্রতিনিধি। সংসদ নেতা, সংসদ উপনেতা, হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, বিরোধীদলীয় নেতাসহ সংসদেও সরকারি ও বিরোধী দলে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করছেন। এছাড়া ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বোচ্চ ফোরাম থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ঘোষিত দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের ১৫ জনের মধ্যে পাঁচজন নারী। এছাড়া দলের ৩১ সদস্যের নির্বাহী কমিটিতে তিনজন নারী রয়েছেন। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটিতে ১৫ জনের মধ্যে নারী মাত্র একজন। এ দলের নির্বাহী কমিটির ১৬৪ জনের মধ্যে ১১ জন নারী। জাতীয় পার্টির সর্বোচ্চ ফোরাম প্রেসিডিয়াম কমিটির ৩১ জনের মধ্যে দুজন নারী। এছাড়া বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদসহ বাম দলগুলোর সর্বোচ্চ ফোরামে এখনো ৩৩ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয় নি।

২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৯ জন নারী সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৭ জন এবং বিএনপির ২ জন। তবে সংরক্ষিত নারী আসনসহ নবম জাতীয় সংসদে সর্বমোট ৬৪ জন নারী সদস্য রয়েছেন, যা মোট সদস্যের শতকরা ১৮ দশমিক ৬ ভাগ।

দেশের স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ইউনিয়ন ও উপজেলায় নারীর প্রতিনিধিত্ব গোটা বিশ্বেই নজিরবিহীন। স্থানীয় পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভুক্তিকে অসাধারণ সাফল্য হিসেবে বিশেষজ্ঞরা অভিহিত করেছেন। শুধু দক্ষিণ এশিয়াই নয়, পৃথিবীর অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারে নারী জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি রেকর্ড সংখ্যক। কারণ বিগত তিনটি নির্বাচন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রতিবারই নারীরা কোটার বাইরে পুরুষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্বাচন করে জয়ী হয়েছেন। সর্বশেষ ২০০৩ সালের পর বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের চার হাজার পাঁচশ চারটি ইউনিয়নে সংরক্ষিত কোটায় সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৩ হাজার ৫১২ জন নারী মেম্বার স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এর পাশাপাশি ২৩২ জন নারী চেয়ারম্যান নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এবং জয়ী হয়েছেন ২২ জন।

সারা দেশে ৪৮২টি উপজেলার মধ্যে ৪৮১টির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ২০০৯-এর ২২ জানুয়ারি। এর মধ্যে সংরক্ষিত কোটায় ৪৮১ জন ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও সরাসরি নির্বাচনে তিনজন নারী উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৮ মার্চ ২০১০)।

নারীর অগ্রগতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদ্যোগ

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ (১৯৬১) : ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশে বহুবিবাহ, তালাক, তালাক ছাড়া অন্যভাবে বিবাহবিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, দেনমোহর— এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। এই অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, বর্তমান বিয়ে বলবৎ থাকাকালে সালিশি পরিষদের লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া অন্য বিয়ে করা যাবে না। সালিশি পরিষদে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে বিষয়টি ন্যায়সংগত বলে নিঃসন্দেহ হলে তাদের বিবেচনা মতে কোনো শর্ত থাকলে শর্তসাপেক্ষে বিষয়টি মঞ্জুর হবে। অন্যথায় ব্যক্তিকে বর্তমান স্ত্রীর দেনমোহরের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হবে, তা না হলে বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায়যোগ্য হবে। তালাক মৌখিকভাবে হবে না। এর জন্য চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ দিতে হবে। অন্যথায় একবছরের জেল অথবা দশ হাজার টাকা অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচ দিতে ব্যর্থ হলে আইনের সহযোগিতা নেয়া যাবে এবং চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করতে হবে। ১৯৩৯-এর আইন অনুযায়ী একজন নারী আইনে বর্ণিত কারণসাপেক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারবেন।

১৯৭২ সালে সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষ সমতার কথা উল্লেখ করে ৬৫ অনুচ্ছেদে নারীর রাজনৈতিক সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সংসদে নারীআসন সংরক্ষণের ঘোষণা দেয়া হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রথম প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ। এ সময় নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠিত হয়।

১৯৭৪ সালে বিবাহ নিবন্ধন আইন প্রণয়ন করা হয়।

১৯৭৬ সালে পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নারী নিয়োগের জন্য অধ্যাদেশ জারি করা হয় ও জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৮০ সালে ড. সুফিয়া খাতুন পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। একই বছর ২৬ জুন ১ হাজার নারী স্বাক্ষরিত যৌতুকবিরোধী আইন প্রণয়নের দাবিতে জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং ২৬ ডিসেম্বর যৌতুকবিরোধী আইন পাস হয়। এই আইনে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি যৌতুক দেয় অথবা নেয় অথবা দিতে বা নিতে প্ররোচনা দেয়, তাহলে সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে; যার মেয়াদ এক থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে। যদি যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। যৌতুকের জন্য মৃত্যু হলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। যৌতুকের জন্য গুরুতর আহত করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হবে, যা কোনোভাবেই ৫ বছরের কম হবে না। নির্যাতনকারী অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন, নারী পাচার নিরোধ ও শাস্তিবিধানের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়।

১৯৮৪ সালে ৪টি ধারা সংরক্ষণসাপেক্ষে বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদে স্বাক্ষর করে।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ (১৯৮৫) : পারিবারিক বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি স্থানীয় ও পৃথক বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন থেকেই এই আদালত ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে পারিবারিক আদালতের নিম্নলিখিত ৫টি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত মামলা গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আছে। এগুলো হলো— বিবাহ-বিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, দেনমোহর, খোরপোশ, শিশুসন্তানের অভিভাবকত্ব তত্ত্বাবধান।

১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে নারীর পক্ষে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রিপরিষদে ড. নাজমা চৌধুরী অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংসদে বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনা।

১৯৯৫-এ সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক বিশাল কর্মযজ্ঞ— বেইজিং চতুর্থ নারী সম্মেলন। ১৯০টি দেশের ৩৫ হাজার প্রতিনিধির অংশগ্রহণে এ ছিল এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ বৈশ্বিক শীর্ষ সম্মেলন। বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বা পিএফএ হলো বৈশ্বিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত নারীর ক্ষমতায়নের একটি দিকদর্শন। বাংলাদেশ সরকার ও এনজিও প্রতিনিধিরা বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে ২৫০টি নারী সংগঠনের নেতৃত্ব দেন ড. নাজমা চৌধুরী। এসময় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন করা হয়।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত হন বেগম খালেদা জিয়া। মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে বেগম মতিয়া চৌধুরী ও সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী নিয়োগ পান।

১৯৯৭ সালে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর ইউনিয়ন পরিষদে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত হয় একটি নতুন আইন। এতে নারীদের ৩টি (এক-তৃতীয়াংশ) করে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়। নিঃসন্দেহে নারীর ক্ষমতায়নে এটি একটি বিরাট অর্জন। একই বছর স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে

সরাসরি নির্বাচনের জন্য আইন পাস করা হয়। ১৯৯৮ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ১১০টি সাধারণ আসনসহ ১২ হাজার ৮২৮টি আসনে সদস্য হিসেবে এবং ২৩টি আসনে চেয়ারম্যান (চেয়ারপারসন) হিসেবে নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি : বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন-এর আলোকে বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রবর্তন করা হয়। যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত বাংলাদেশের বৃহত্তম নারীসমাজের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এতে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সমস্ত বৈষম্য ও সহিংসতা দূর করার কথা বলা হয়। এছাড়াও এ নীতিতে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং নারী নির্যাতন রোধে প্রশিক্ষণ, আইন সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়।

১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে নারী নির্যাতন সম্পর্কে বলা হয়—

- নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ;
- পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ;
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন;
- নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান;
- নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণের লক্ষ্যে আইনের যথাযথ প্রয়োগে বিচার ব্যবস্থায় এবং পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- বিচার ও পুলিশ বিভাগকে জেন্ডার সংবেদনশীল করা ও নারীর অধিকারসংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজকরণ।

এরপর অবশ্য ২০০৪ সালে আকস্মিকভাবে ১৯৯৭ সালে প্রবর্তিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে বেশ কিছু নেতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়। ব্যাপক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে ২০০৮ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নতুন নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করে। যদিও তা বাস্তবায়ন করা হয় নি। নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২০০৯-এর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবসে ১৯৯৭ সালের নারীনীতি পুনর্বহালের ঘোষণা দেয়া হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) : নারী নির্যাতন ও পাচারের বিপরীতে কঠিন শাস্তির বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পাস করা হয়। এই আইনে যৌতুক, ধর্ষণ, পাচার, দহনকারী পদার্থের প্রয়োগ, যৌন পীড়ন— এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত আছে। নারী ও শিশু ধর্ষণের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এর সঙ্গে অর্থদণ্ড হবে। ধর্ষণের ফলে বা ধর্ষণপরবর্তী অন্য কোনো কারণে নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে ধর্ষণকারী মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। জরিমানা হবে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা। দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করার ফলে নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে বা আহত হলে প্রত্যেকের মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হবে। জরিমানা হবে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা সম্মতি ছাড়া কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কোনো কাজ দ্বারা সম্ভ্রমহানি হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণে কোনো নারী আত্মহত্যা করলে এর জন্য অনধিক দশ বছর কিন্তু ন্যূনতম পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হবে। যৌনকামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করলে বা শ্লীলতাহানি করলে ওই ব্যক্তির অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হবে।

২০০০ সালে সিডও সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন করা হয়। একই সময়ে সন্তানের পরিচিতির সব ক্ষেত্রে পিতার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এবং আরো গভীরে গিয়ে ২০০০ সালে গৃহীত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে বিশ্বকে দ্রুত দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত করা, জেন্ডার বৈষম্য নির্মূল করা এবং বিশ্ববাসীকে শিক্ষিত করে একটি নির্মল ও রোগমুক্ত পরিবেশ সৃজনে যে আটটি লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে তার তৃতীয়টি হলো, নারী-পুরুষ সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রণোদনা। এছাড়াও, গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশে নারী-পুরুষের বৈষম্য নিরসনের আনুষ্ঠানিক লক্ষ্য জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং পিআরএসপি প্রণীত হয়।

২০০১ সালে খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বিরোধী দলের নেতা হন শেখ হাসিনা।

২০০৪ সালে সংসদে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১০ বছরের জন্য সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে ৪৫টি নারী আসন সংরক্ষণ করে বিল পাস হয়।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন (২০০৪) : নারী ও শিশু নির্যাতন হ্রাস করার ক্ষেত্রে এই আইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনে শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্মসংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধন করতে হবে। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৩০ দিনের মধ্যে মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধন না করালে ৫০ টাকা জরিমানা বা দুই মাস জেল হবে।

২০০৬ সালে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক (যা পরবর্তী সময়ে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে সন্নিবেশিত হয়) রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ করার বিধান রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়।

২০০৮ সালের মে মাসে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার নতুন করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নারীর জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচনের জন্য ভাইস চেয়ারম্যান পদটি সংরক্ষণ করে।

২০০৮-এর জুনে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিধির খসড়াতে একজন সিইসি ও দুই কমিশনারের একজনকে অবশ্যই নারী হতে হবে উল্লেখ করে নতুন খসড়া বিল আনা হয়।

২০০৮-এর ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ হিসেবনিকেশের সব মানচিত্র পালটে দেয়। এ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ মোট ৫৫ জন নারী বিভিন্ন আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে ১৯ জন নারী রাজনীতিবিদ পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করেন। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন শেখ হাসিনা, খালেজা জিয়া, রওশন এরশাদ, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, ডা. দীপুমনি, মেহের আফরোজ চুমকি, বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, সারাহ বেগম কবরী, রুমানা মাহমুদ, হাসিনা আহমেদ, সাগুফতা ইয়াসমিন, নিলুফার জাফরউল্লাহ, রেবেকা মমিন, মাহবুব আরা বেগম গিনি, হাবিবুন নাহার, অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম এবং সুলতানা তরুণ।

২০০৯-এর ৭ জানুয়ারি শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। মন্ত্রিপরিষদের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয় নারীদের হাতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে শপথ নেন যথাক্রমে অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, মতিয়া চৌধুরী ও ডা. দীপুমনি। শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। পরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নির্বাচিত হন শিরীন শারমিন চৌধুরী। এদেশের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এ ঘটনা একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

২০০৯-এর ২২ জানুয়ারি দীর্ঘ ১৮ বছর পর অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা পরিষদের নির্বাচন। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও নানা কারণে এ নির্বাচনটি স্থগিত ছিল। এ নির্বাচনের মাধ্যমে একদিকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি গতিশীলতা ফিরে এসেছে। এবারের নির্বাচনে প্রতিটি উপজেলায় একজন করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন, নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে সরাসরি ভোটে ২ জন নারী উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁরা হলেন কামরুন্নাহার শিউলি (কবিরহাট, নোয়াখালী) এবং রোকেয়া আজাদ (রামগতি, লক্ষ্মীপুর)। এখানে উল্লেখ্য, কামরুন্নাহার শিউলি কবিরহাট উপজেলার প্রথম চেয়ারম্যান।

১৯ মার্চ নবম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের ৪৫ জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। দলীয় কোটা অনুযায়ী ৪৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে ৩৬ জন, বিএনপি থেকে ৫ জন এবং জাতীয় পার্টি (এ) থেকে ৪ জন নির্বাচিত হন। নির্বাচিতরা ২৯ মার্চ শপথ গ্রহণ করেন এবং সংসদ অধিবেশনে যোগদান করেন।

যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায় : ২০০৯ সালের ১৪ মে যৌন হয়রানি বন্ধে বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীকে নিয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন।

এর আগে ইভটিজিং ছিল গৌণ অপরাধ। এর সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১ বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়ই (দণ্ডবিধি-৫০৯ ধারা)। এই রায়ের ফলে ইভটিজিং এখন যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, শাস্তি অর্থদণ্ডসহ ৩-১০ বছরের কারাদণ্ড (নারী-শিশু নির্যাতন সংশোধনী আইন, ২০০৩-এর ১০ নম্বর ধারা)। ইভটিজিং বা হয়রানির আধুনিকতম মাধ্যম ই-মেইল, এসএমএস, টেলিফোন প্রভৃতি পূর্বে আইনের আওতা-বহির্ভূত থাকলেও হাইকোর্টের রায়ে এগুলো যৌন হয়রানির অস্ত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। রায়ে যৌন হয়রানিকে মেয়েদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারীর ওপর যৌন নিপীড়নকে আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে দেখা হয়েছে। যৌন হয়রানির আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হয়রানির ঘটনা বিচারের ক্ষেত্রে হয়রানি বা নিপীড়নকারীর উদ্দেশ্যে বা মানসিকতার বদলে আক্রান্ত নারীর মানসিক যন্ত্রণা ও নির্যাতনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধু কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের অশালীন উক্তি, কটূক্তি, কারও দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো প্রভৃতিকেও যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তার জন্যও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। রায়ে যৌন নিপীড়ন ও শাস্তি সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করা এবং কার্যকর শাস্তির বিধান করে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে। আর আইন প্রণয়ন না-হওয়া পর্যন্ত এই রায় মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে, শারীরিক ও মানসিক যেকোনো ধরনের নির্যাতন যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে। বর্তমানে এর আওতা অনেক প্রশস্ত, যার মধ্যে পড়ে অবাঞ্ছিত যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা রসিকতা; গায়ে হাত দেওয়া বা দেওয়ার চেষ্টা করা; ই-মেইল, এসএমএস ও টেলিফোনে বিড়ম্বনা; পর্নোগ্রাফি বা যেকোনো ধরনের চিত্র, অশ্লীল ছবি ও দেয়াললিখন; অশালীন উক্তিসহ আপত্তিকর কোনো কিছু করা; কাউকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সুন্দরী বলা; কোনো নারীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, যেকোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা; মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা, যৌনসম্পর্ক স্থাপনের দাবি বা অনুরোধ; অন্য যেকোনো শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ, যার মধ্যে যৌন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন।

২০০৯-এর ১৭ মে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানায় প্রথম নারী ওসি হিসেবে নিয়োগ পান হোসনে আরা বেগম।

২০১০-এর ২২ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন অনুমোদিত হয়।

২০১০-এর ২৯ জুন জাতিসংঘের নারীবৈষম্য বিলোপ-সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ কমিটি অন দ্য ইলিমিনেশন অব ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট উওম্যান (সিডও)-এর নির্বাচনে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বেলজিয়ামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ইসমাত জাহান। ২০১১-'১৪ পর্যন্ত চার বছরের জন্য এ কমিটির সদস্য থাকবেন ইসমাত জাহান। ১৮৫ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে সর্বোচ্চ ১৫৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন ইসমাত জাহান। নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে জাপান (প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০১০)।

উপসংহার

বাংলাদেশে গত একশ বছরে অনেক ক্ষেত্রেই নারীর ক্ষমতায়নে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর বিরুদ্ধে বঞ্চনা ও অপরাধ রোধসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা, আলোচনা এমনকি কিছু আন্তরিক প্রচেষ্টাও বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স বাড়ানো, বিয়েবিচ্ছেদে বর ও কনের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইউনিয়ন পরিষদে প্রত্যক্ষ ভোটে নারী প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ভর্তিতে জনসংখ্যার অনুরূপ ভারসাম্য অর্জন, মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ৬০ শতাংশ নারী নিয়োগের বিধান, বিদ্যালয়ের ভর্তির ফরমে মায়ের নাম উল্লেখ, পেনশনভোগীর মৃত্যু হলে তার বিধবা পত্নীর পেনশন লাভ, একাকী নারী ও বিধবাদের জন্য মাসিক ভাতা (সীমিত পরিসরে) এবং মাতৃত্বকালীন ৪৫ হাজার মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য মাসিক ভাতাসহ বেশ কিছু কর্মকাণ্ডের ফলে নারীদের অবস্থা পরিবর্তনে কিছুটা হলেও ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে।

প্রথাগত পেশা ছেড়ে ব্যাংক, বিমা, বিনোদন থেকে শুরু করে বিমান চালনা বা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতেও আগ্রহভরে মেয়েরা এগিয়ে আসছে। অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়াটাকে নতুন প্রজন্মের নারীসমাজ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। সুযোগ পেলে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানতালে এগিয়ে আসার প্রবণতাকে নাগরিক জীবন খুব

স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছে। হাটবাজার, জনসভা, মিটিং, মিছিল, খেলার মাঠ, শিক্ষায়তনের ক্যাম্পাস— সর্বত্র নারীর স্বচ্ছন্দ চলাচল যেমন বেড়েছে, তেমনি বিশ্বায়নের জোয়ারে তার অর্জনের আকাঙ্ক্ষার সীমানাও হয়েছে দিগন্ত প্রসারী। বেশভূষা, আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এ প্রজন্মের মধ্যবিত্ত নারী বহু ক্ষেত্রে তার পুরুষ প্রতিপক্ষের চেয়ে উজ্জ্বল এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আপোসহীন।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত দুটি বিষয়— জাতীয় সংসদে নারীর প্রবেশযোগ্যতা ও নারী ইস্যুর প্রতি রাজনৈতিক দলের অবস্থান। নারীর ক্ষমতা ও সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ দুটি ক্ষেত্রে নারীর জোরালো উপস্থিতি প্রয়োজন। নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় জড়িয়ে আছে। এই উপাদানগুলো নারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা ধারণ করে রাজনৈতিক ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ক্ষেত্রসমূহ। নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। কেননা, নারীর প্রয়োজন ও পরিপ্রেক্ষিত যথাযথভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা নারী তার জীবনে ও অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণ করে থাকে। এখানেই নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পারস্পরিক সম্পৃক্তি। কিন্তু এ দুটি ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন হয় নি।

তবে একথা বলা যায় যে, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নে সামাজিক বাধাবিপত্তির কুয়াশা আস্তে আস্তে হলেও কেটে যাচ্ছে। নারী জাগরণের আন্দোলনেরই ফসল এটি। তবু আরো বেশি জনমত তথা জনসমর্থনজনিত প্রণোদনা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের যথাযথ উন্নতির জন্য নারীকে আরো বেশি পরিমাণে রাজনীতিসম্পৃক্ত করতে হবে। নারীবিহীন রাজনীতি কোনো রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক নয়। তবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের পথটি সুগম করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। এ জন্য সবার আগে দরকার সমাজের বিবেককে জাগ্রত করা। সমাজের বিবেককে জাগ্রত করতে অবশ্যই সরকারসহ সব মহলের রাজনৈতিক সদিচ্ছা জরুরি। তাতে ঘাটতি দেখা দিলে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই। বর্তমানে আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, তাকে আরো বিকশিত হতে দিতে হবে, এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা নারী জাগরণ তথা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দিশারি হয়ে কাজ করছেন, তাঁদের বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টার পাশাপাশি সম্মিলিতভাবে প্রচণ্ড শক্তিতে সমাজকে একটি বিরাট ধাক্কা দিতে হবে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী আওয়াজ উঠেছে যে, নারীর অধিকার মানুষের অধিকার অর্জনেরই একটি বিশিষ্ট দিক। এই স্লোগানকে ছড়িয়ে দিতে হবে। মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামের পরিমণ্ডলে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সুফল বেশি ফলবে বলে মনে হয়; অন্য কোনোভাবে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

চিররঞ্জন সরকার সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি, ব্র্যাক। chiroranjan@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. *রাজনীতিতে নারী*, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, লালমাটিয়া, ঢাকা, মার্চ ২০১০
২. অন্যান্য